রাজশাহীর প্রান্তরে প্রান্তরে মুক্তিযুদ্ধ

- ডঃ মহসিন আলী

বাংলাদেশের যে কোন গণতান্ত্রিক আন্দোলন ও অধিকার আদায়ের সংগ্রামে রাজশাহী এলাকার সংগ্রামী জনগণ যেমন কখনো পিছিয়ে ছিলনা- বাংলাদেশের মহান মুক্তিযুদ্ধের সেই রক্তক্ষয়ী উত্তাল দিনগুলিতে বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের বিপ-বী জনতা দেশের অন্যান্য অঞ্চলের মুক্তিকামী জনতার পাশাপাশি বীর দর্পে এগিয়ে চলেছিল এবং লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে মুক্ত করেছিল রাজশাহী।

রাজশাহীর ইতিহাস যেমন ঐতিহ্যবাহী, সনাতন ও পুরাতন বাঙালি জাতির সভ্যতা, সাংস্কৃতি, ভাষা স্বাধীকার ও স্বাধীনতা আন্দোলনের ইতিহাসও তেমনি অনেক পুরাতন ও গৌরবোজ্জ্বল। বৃহত্তর রাজশাহীবাসী আমাদের পূর্বসূরীদের গৌরবময় সভ্যতা ও সংগ্রামী ইতিহাসের কথা পড়ে অহংকার ও গৌরববোধ করতে পারে। পূর্ব পুরুষদের গৌরবের ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে আগামীদিনের দেশ গড়ার সংগ্রামে নিজেদেরকে তৈরী করতে পারে তারা।

বৃহত্তর রাজশাহী জেলা বলতে বর্তমানের রাজশাহী, চাঁপাই নবাবগঞ্জ, নাটোর ও নওগাঁ জেলাকে ধরা হয়- যা পূর্বে ছিল রাজশাহী জেলার মহকুমাসমূহ। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে প্রাচীন বাংলার পুন্দ্র অঞ্চলের একটা জেলা ছিল রাজশাহী। বর্তমানের রাজশাহী শহরের মাত্র ৯ মাইল অদূরে 'রামপুর বোয়ালিয়া' অবস্থিত যেখানে ছিল রাজা বিজয় সেনের রাজধানী। রাজশাহীর এই রামপুর বোয়ালিয়া থেকেই রাজা বিজয় সেন দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া ও শ্রীলঙ্কা আক্রমণ করেছিলেন। 'বিউলিহ' হিসেবে ছিল পরিচিত পূর্ব বাংলার রাজশাহী। রাজশাহী রেশম শিল্পের প্রশাসনিক প্রধান কেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। মূলতঃ রেশম চাষ ও ফ্যাক্টরীর ব্যবসা ও বাণিজ্যিক কেন্দ্র হিসেবে রাজশাহী নির্বাচিত হয়। সরকারীভাবে কৃষি উদপাদনের কেন্দ্র হিসেবেও রাজশাহী অঞ্চল স্বীকৃতি লাভ করে।

১৭৭২ সালে রাজশাহী একটি জেলা হিসেবে সুপ্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৭৬ সালে মিউনিসিপাল কর্পোরেশন প্রতিষ্ঠিত হয় শহরে। এই সময় বাংলার উত্তরাঞ্চলের বৃহত্তর রাজশাহী, রংপুর, দিনাজপুর, খুলনা, যশোহর, কুষ্টিয়া, বগুড়া ও পাবনা জেলা সমূহকে নিয়ে রাজশাহী বিভাগ প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৮৯৭ সালের ১২ জুনের এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে রাজশাহী শহরের তৎকালীন প্রায় সকল সরকারী ভবনই দারুনভাবে ধ্বংসযজ্ঞের শিকার হয়। চির দূরন্ত ও দূর্বার পদ্মা নদীর পাড়ে অবস্থিত রাজশাহী শহর এক সময় কলকাতা ও ঢাকা তথা পূর্ব ও পশ্চিম বাংলার বাণিজ্যিক সেতু বন্ধন ছিল। রাজশাহী থেকে নিয়মিত পদ্মা নদী দিয়ে ভাগিরথী নদী হয়ে কলকাতায় স্টীমার যাতায়াত করত। অন্যদিকে পদ্মা যমুনা হয়ে বুড়িগঙ্গা দিয়ে ঢাকার সাথেও রাজশাহীর স্টীমারে নিয়মিত ব্যবসা বাণিজ্য ও যাত্রী পরিবহনের কাজ চলত।

এই রাজশাহী অঞ্চলেই ১৫২ বছর পূর্বে ১৮৫৫ সালে তৎকালীন বৃটিশ ও স্থানীয় রাজাদের শাসনের ও শোষণের নৃশংসতার বিরুদ্ধে সাওতাল বিদ্রোহ শুরু হয়। এর পূর্বে ১৮১১ ও ১৮২০ সালে এই সাওতাল বিদ্রোহ ও গণজাগরণের আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। তৎকালীন স্থানীয় রাজাদের সহযোগিতায় বৃটিশ সেনারা নির্বচারে সাওতালদের ওপর গুলি চালিয়ে কয়েক হাজার বিদ্রোহীদের হত্যা করে। এরপর ১৯৫০ সালে ইলামিত্রের নেতৃত্বে রাজশাহীর কানসাট ও সানতালে কৃষক বিদ্রোহ গড়ে উঠে। তৎকালীন পাকিস্তানী পুলিশ মিলিটারীদের সশস্ত্র আঘাতে কয়েক শত কৃষক শহীদ হয় এই বিদ্রোহে। এর পূর্বে ১৯৪৬ সালে সারা উত্তর বঙ্গব্যাপী তেভাগা আন্দোলন শুরু হয় ইলামিত্রের নেতৃত্বে। রাজশাহীর নাচোল এই আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল হিসেবে পরিগণিত হয়। স্থানীয় রাজা ও জমিদার এবং বৃটিশ রাজ্যের বিরুদ্ধে ভূমিহীন কৃষকদের এই তেভাগা আন্দোলন বাংলা তথা সারা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ইতিহাসে এক বিশেষ অধ্যায় হিসেবে স্বীকৃত হয়ে আছে।

বৃটিশ শাসনের অবসান হলে পাকিস্তানের শাসনের প্রথম থেকেই বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চল পাকিস্তান বিরোধী সকল আন্দোলনে যেমন অগ্রগামীর ভূমিকা পালন করেছে তেমনি বৃটিশ ও পাকিস্তানী বর্বর শাসক ও শোষকদের নৃশংসতার বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে আন্দোলন করে আসছে। এই সাহসী সংগ্রামে রাজশাহীর বীর জনতা অন্যদেরকে অনুপ্রেরণা দিতেও হয়নি পিছপা।

চির অম্-ান এই গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের জ্বলন্ত শিক্ষা ও অনুপ্রেরণা নিয়েই বৃহত্তর রাজশাহী অঞ্চলের বিপ-বী জনগণ বার বার ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন, ১৯৬০ সালের পর থেকে আইয়ুব খানের শামরিক শাসনের বিরুদ্ধে সকল আন্দোলন তথা ১৯৬২ সালে হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে, ১৯৬৬ সালে ৬ দফা আন্দোলনের স্বপক্ষে এবং ১৯৬৯ সালের সেই দূর্বার ছাত্রজনতার ১১ দফা আন্দোলনের উত্তাল দিনে রাজশাহীর জনগণ সক্রিয়ভাবে যোগ দিয়েছে ও রাজপথে রক্ত ঝরিয়েছে। ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির মহান শহীদদের রক্ত ঝরানোর পর সম্ভবত রাজশাহীতেই ১৯৬৯ সালের ১৮ ফেব্রুয়ারি আর একটা রক্ত ঝরা দিন যা তৎকালীন পাকিস্তানের ভীতকে কাঁপিয়ে দিয়েছিল এবং পাকিস্তান ভাঙ্গার ইতিহাসে ও স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায় এক উজ্জ্বল মাইল ফলক হয়ে যুগ যুগ ধরে জ্বলজ্বল করে আসবে। এইদিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ও রসায়ন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডঃ শামছুজ্জোহা শহীদ হন। আর এই শহীদি রক্তের ভীক্ষ্নতায় এশিয়ার লৌহ মানব হিসেবে খ্যাত ফিল্ড মার্শাল মোঃ আইয়ুব খানকেও পাকিস্তানের রাষ্ট্রপতি তথা শাসক থেকে বিদায় নিতে হয়েছিল। মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে শহীদ ডঃ শামছুজ্জোহাই সম্ভবত প্রথম একজন উচ্চশিক্ষিত বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শহীদ বুদ্ধিজীবী যিনি পাকবাহিনীর হাতে নৃশংসভাবে শহীদ হন।

মহান স্বাধীনতা যুদ্ধের প্রাক্কালে ১৯৭০ সালের পাকিস্তানের জাতীয় সংসদ ও পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সংসদদের নির্বাচনে রাজশাহী অঞ্চলের জনগণ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের সকল প্রার্থীকেই বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করে। কিন্তু নির্বাচিত সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর না করে পাকিস্তানের সামরিক সরকার যে টালবাহানা শুরু করেছিল তার বিরুদ্ধে বাংলার জনগণের সাথে কাঁধ মিলিয়ে ১৯৭১ সালের প্রথম থেকেই নিয়মিত সভা ও মিছিল করে আসছিল রাজশাহী জনগণ বিশেষ করে ১৯৭১ সালের ১ মার্চ থেকে দূর্বার গতিতে পাকিস্তানী সামরিক সরকারের বিরুদ্ধে অসহযোগ আন্দোলনে রাজশাহীর জনগণ ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে পরে এবং বঙ্গবন্ধুর ঐতিহাসিক ৭ মার্চের ভাষণের পর প্রকৃত পক্ষে সত্যিকার মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি গ্রহণ করতে থাকে। এর পূর্বে ৩ মার্চ রাজশাহী শহরে কারফিউ ভঙ্গ করে জনতা মিছিল বের করে রাজশাহীর টেলিফোন ভবন ঘেরাও করলে পাকবাহিনীর গুলিতে বহু হতাহত হয়। ৪ মার্চে পূর্ণদিন হরতাল পালন করা হয় ও ৫ মার্চ

রাজশাহীর প্রান্তরে প্রান্তরে মুক্তিযুদ্ধ

ঐতিহাসিক ভবন মোহন পার্কে আওয়ামী লীগের প্রতিবাদ সভা করা হয়। রাজশাহী জেলা সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ ও সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। ১১ মার্চ জনাব এএইচএম কামরুজ্জামান ভুবন মোহন পার্কে ভাষণ দেন। এরপর প্রতিদিনই কৃষক শ্রমিক ছাত্র জনতার জঙ্গী মিছিল রাজশাহী শহর ও বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা প্রদক্ষিণ করে ও এলাকা নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখে। ২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে রাজশাহীর জনগণ পালন করে প্রতিবাদ দিবস হিসেবে। রাজশাহী পুলিশ লাইনে এই পাকিস্তান দিবসে স্বাধীন বাংলার পতাকা উত্তোলন করা হয় হাবিলদার আতাউর রহমানের নেতৃত্বে। এছাড়া রেডিও স্টেশনে রাজশাহী পতাকা উত্তোলন করা হয়। ঐদিন সাওতালরাও জঙ্গী মিছিল বের করে বাংলাদেশের স্বাধীনতার স্বপক্ষে। ২৪ মার্চ রাজশাহী জনতার দিনব্যাপী মিছিল করে আর গোপনে গোপনে নেয় মুক্তিযুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি। সবাই অধীর আগ্রহে ছিল বঙ্গবন্ধুর নির্দেশের অপেক্ষায়। জনতার ঢল মিছিলে মিছিলে চলতে থাকে রাজশাহীর রাজপথে ২৫ মার্চের সারাদিন। মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতি চলতে থাকলেও কেউ বুঝে উঠতে পারেনি পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর চক্রান্ত।

২৫ মার্চের রাত নয়টার দিকে হঠাৎ রেডিও থেকে ও মাইকের মাধ্যমে রাজশাহী শহরে রাত দশটা থেকে কারফিউ জারি করার ঘোষণা করা হলো দখলদার পাকিস্তান বাহিনীর পক্ষ থেকে। রাত ১০টার পূর্ব থেকে রাজাশাহী শহরে কাঁটাখালি থেকে হরগ্রাম পর্যন্ত এবং পদ্মার বাঁধ থেকে উপশহর পর্যন্ত পাকিস্তানী মিলিটারীদের সশস্ত্র ট্রাকে ভরে গেল। ফাঁকা শহরে যেন থম থমে দারুন ভীতির এক পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। রাজশাহী শহরে ভূবন মোহন পার্কে অনুষ্ঠিত 'রক্ত কথা বলে' নাটক মঞ্চাস্থ করা হয় এবং রাত দশটার পূর্বেই শেষ করা হয়। লোকজন সবাই পার্ক ছেড়ে যার যার আস্তানায় ফিরে যায়। রাত প্রায় সাড়ে এগারোটায় শহরের বিভিন্ন এলাকা থেকে প্রচুর গোলাগুলির শব্দ শোনা গেল। মনে হলো বিশাল বিশাল কামানের গোলা ও বোম ফোটার শব্দে সারা শহর যেন প্রকম্পিত হচ্ছে। কেউ বুঝে উঠতে পারছে না কোথায় কি ঘটেছে। ২৫ মার্চের সেই ভয়াল কালো রাত্রি রাজশাহীতেও নেমে এসেছে। কারফিউ দিয়ে জনগণকে বাড়িতে বন্ধ করে পাকসেনারা তাদের সকল অস্ত্র ও শক্তি দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়েছে নিরস্ত্র জনগণের উপর। এরপরই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বাংলাদেশকে স্বাধীন ঘোষণা করেছেন এবং সকল বাঙালি সেনা, ইপিআর, পুলিশ, আনসার ও সকল জনতাকে পাকিস্তানী দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। রাজশাহীর পুলিশ লাইন ও ইপিআর হেড কোয়ার্টার থেকে বঙ্গবন্ধুর বাণী সাইক্লোস্টাইল করে শহরের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

রাতের মধ্যেই খবর ছড়িয়ে পড়ল যে রাজশাহীর উপশহর মিলিটারী ক্যান্টনমেন্ট থেকে মিলিটারীরা ট্যাঙ্কসহ অতর্কিতে আক্রমণ করে পুলিশ লাইনে ও ইপিআর হেড কোয়ার্টারে। এই আক্রমণে কয়েকশত পুলিশ ও বাঙালি ইপিআর জোয়ান শহীদ হন। এদিকে বঙ্গবন্ধুর স্বাধীনতার ঘোষণা ও বঙ্গবন্ধুকে গ্রেফতারের খবর প্রচারিত হলে বাঙালি ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনী এবং পাকসেনা বাহি-নীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানেরা প্রথমে পাকসেনাদের অতর্কিত আক্রমণে বেশ ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হলেও পরবর্তীতে তারা নিজেদের সংগঠিত করে স্বাধীনতার স্বপক্ষে এক শক্তিশালী প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম হয় ২৫ মার্চের শেষ রাতে ২৬ মার্চের সকালের দিকে। ২৬ মার্চের প্রায় সারাদিন সারারাত ধরেই রাজশাহী শহরের বিভিন্ন এলাকায় খন্ডখন্ড যুদ্ধ চলতে থাকে বাঙালি স্বাধীনতাকামী বাহিনীর সাথে স্বশস্ত্র দখলদার বাহিনীর। সারা শহরে কারফিউ জারি থাকলেও সাধারণ জনগণ কারফিউ ভঙ্গ করে শহরে বেরিয়ে পরে যুদ্ধরত বাঙালি সেনা, পুলিশ, ইপিআর, আনসার বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদের সমর্থনে। আগের রাতের যুদ্ধে প্রচুর বাঙালি প্রাণ হারিয়েছে জেনে সাধারণ জনগণ বিক্ষোভে ফেটে পরে। মিছিলে মিছিলে রাস্তায় রাস্তায় গায়েবী জানাজা করা হয় শহীদদের জন্য। এই সময় জানা যায় যে রাজশাহী শহরের রাজনৈতিক নেতা, বুদ্ধিজীবী ও ব্যবসায়ীদের অনেকেই পাকসেনারা ধরে নিয়ে গেছে ও হত্যা করেছে। ছাত্র ও রাজনৈতিক নেতারা কর্মীদেরকে নির্দেশ দিলেন সবাই সশস্ত্র প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে গেরিলা ও সম্মুখ যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পরার জন্য এবং বাঙালি সশস্ত্র বাহিনীর মুক্তিযোদ্ধাদেরকে সর্বাত্মক সাহায্য করার জন্য নির্দেশ দিলেন। ২৭ মার্চে ছাত্রজনতা রাজশাহী পুলিশ লাইনে ও ইপিআর হেড কোয়ার্টারে যেয়ে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের সাথে একাত্ততা ঘোষণা করে এবং অস্ত্র ও প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য আহবান জানায়। বাঙালি সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণের যৌথ প্রতিরোধের মুখে পাকসেনারা পিছু হটতে বাধ্য হয় এবং ২৮ মার্চের মধ্যেই পুলিশ লাইন ও ইপিআর হেড কোয়ার্টার বাঙালিদের দখলে চলে আসে। এই অভুতপূর্ব বিজয়ে সকল বাঙালির মধ্যে যুদ্ধ বিজয়ের এক নতুন উন্মাদনার জোয়ার বইতে থাকে। ছাত্র যুবক জনতা ও সশস্ত্র বাহিনীর সকল অস্ত্রশস্ত্র লাঠি-শোডা যার যা আছে তাই নিয়ে সবাই রাজশাহী শহর শত্রু মুক্ত করার জন্য ঝাঁপিয়ে পরে।

এই সময় মুক্তিযোদ্ধাদের পক্ষে সামরিক নেতৃত্বে আসেন তৎকালীন ইপিআর এর ক্যাপ্টেন গিয়াসউদ্দিন, ক্যাপ্টেন রশিদ ও নায়েব সুবেদার সিরাজউদ্দিন লস্কর। সঙ্গে যোগ দেন আরো শত শত বাঙালি ইপিআর সদস্যবৃন্দ এবং পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা। ছাত্র নেতাদের মধ্যে- আবদুল কুদ্দস, আবদুল করিম মোঃ জাহাঙ্গীর, মাহফুজুর রহমান, সাইফুল ইসলাম, নুরুল ইসলাম, ঠান্ডু, ভুলু, মঞ্জু, রতন ও এই লেখক মোঃ মহসিন আলী ছিলেন অন্যতম। স্থানীয় বীর জনতাও তাদেরকে সর্বতভাবে সাহায্য ও সহযোগিতা দিয়ে চলছে। ৩১ মার্চ থেকে ৩রা এপ্রিল পর্যন্ত মুক্তিযোদ্ধারা রাজশাহী শহরের বিভিন্ন স্থান থেকে পাকসেনাদের খন্ড খন্ড যুদ্ধে পরাজিত করে শহর থেকে বিতারিত করে। পাকসেনারা তখন রাজশাহী শহর ছেড়ে দিয়ে উপশহরে ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে অবস্থান নেয়। তখন মুক্তিবাহিনী রাজশাহী শহরের অদূরে উপশহরের ক্যান্টনমেন্টের চারিদিকে ট্রেঞ্চ খুঁড়ে শক্ত প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এদিকে ৩রা এপ্রিল ক্যাপ্টেন গিয়াস ভারতীয় বিএসএফ এর কমান্ডার কর্ণেল সেন ও মেজর ত্রিবেদীর সঙ্গে সাক্ষাত করে অস্ত্র সাহায্যের আবেদন জানালে তারা উপরের নির্দেশ ছাড়া তাৎক্ষণিক কোন সহযোগিতা দিতে অপরাগতা প্রকাশ করেন। ৬ এপ্রিল সেনা ছাউনি থেকে বেরিয়ে এসে হঠাৎ পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের উপর স্বয়ংক্রিয় অস্ত্রের সাহায্যে আক্রমণ চালায়। অদম্য সাহসের সাথে মুক্তিযোদ্ধারা যুদ্ধ করে পাকসেনাদের হামলা প্রতিহত করে তাদেরকে পূণরায় ক্যান্টনমেন্টের ভিতরে আটকে ফেলে। এই যুদ্ধে বেশ কিছু পাকসেনার মৃতদেহ ও প্রচুর অস্তসস্ত্র উদ্ধার করা হয়। পাক সেনারা সেনা ছাউনির চারদিকে মাইন পেতে রাখে ও কাঁটাতারের বেড়া দিতে থাকে। এদিকে ঢাকা থেকে আগত বিমান বাহিনীর পাকসেনারা মুক্তিযোদ্ধাদের অবস্থানে উপর উপুরযোপুরি বোমা বর্ষণ শুরু করে। ৭ থেকে ১০ এপ্রিলের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনা ছাউনীর প্রায় ৩০০/৪০০ গজের মধ্যে পৌঁছে যায় মাথার উপরে পাক বিমান হামলা সত্ত্বেও। কিন্তু মাইন ও কাঁটা তারের জন্য মুক্তিযোদ্ধাদের অগ্রসর হওয়া কঠিন হয়ে পরে। শত্রু বাহিনীর বিমান হামলা, ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামানের গোলা চলতেই থাকে। পাক সেনা কমান্ডার কর্ণেল শওকত বেলুচ ৭ এপ্রিলের যুদ্ধে গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হলে তাকে হেলিকপ্টারে

রাজশাহীর প্রান্তরে প্রান্তরে মুক্তিযুদ্ধ

ঢাকা নিয়ে যায়। এ খবরে মুক্তিযোদ্ধারা আরো উৎসাহিত হয়। ওদিকে আবার উপশহরে বসবাসকারী বিহারীদের হাতে পাকসেনারা অস্ত্র তুলে দেয় বাঙালি নিধন করার জন্য। মুক্তিযোদ্ধরা তখন কয়েক ডজন পাওয়ার পাম্প নিয়ে এসে সেনা ছাউনীর দিকে পাম্পের পানি ছাড়তে থাকে যেন সেনা ছাউনী পানিতে ডুবে যায় এবং পাক সেনারা আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হবে আসায়। এইভাবে অদম্য সাহসী বাঙালি মুক্তিজোয়ানরা স্থানীয় জনতার সহযোগিতায় রাজশাহীর পাক সেনাদের ক্যান্টনমেন্ট বা সেনা ছাউনী দখলের আপ্রাণ চেষ্টায় যখন শেষ পর্যায়ে চলে এসেছে তখনই খবর এলো যে পাকিস্তান বাহিনীর দুই ডিভিশন সৈন্য ঢাকা থেকে রওনা হয়ে নগরবাড়ি ঘাট পর্যন্ত পৌঁছে গেছে হিলিকপ্টার, স্টিমার ও ফেরীর মাধ্যমে বিশাল ট্রাক বহর নিয়ে। রাজশাহীর সেনা ছাউনীতে আটকে পড়া পাক সেনাদের উদ্ধার করার জন্যই এই রিইনফোর্সমেন্ট পাঠানো হচ্ছে। এই দুঃসংবাদ শুনে আমাদের অনেকেরই মনোবল ভেঙ্গে দূর্বল হয়ে যায়। রাজশাহী থেকে দুই কোম্পানী সৈন্য উঠিয়ে তখন ১১ এপ্রিল পাবনায় পাঠানো হয়। ১১ এপ্রিলের বিকেলে পাবনার অদূরে পাকবাহিনীরা প্রচন্ড আর্টিলারী ও মটার ফায়ার করতে করতে রাজশাহীর দিকে এগিয়ে আসছে। রাস্তার দুই পাশের বাড়ি ঘর পুড়িয়ে দিতে দিতে তারা এগুচ্ছিল। রাজশাহী পাবনার বর্ডারে মুলাডুলী নামক স্থানে মুক্তিযোদ্ধারা স্থানীয় জনগণের সহযোগিতায় এক প্রতিরোধ গড়ে তুলে এবং অগ্রগামী পাক সেনা বহরকে থামিয়ে দেয়ার চেষ্টা করে। দুই ডিভিশন পাকসেনাদের ট্যাংকে বিধ্বংসী কামান, মর্টার শেল ও উপরে হেলিকপ্টার গানশীপের আক্রমণে হালকা অস্ত্র হাতের বাঙালি মুক্তিযোদ্ধাদের প্রতিরোধ বেশীক্ষণ টিকে থাকতে পারেনি। তারা পিছনে সরে নাটোরের ভিতরে চলে এসে নতুন করে প্রতিরোধ গড়ে তুলে। এদিকে ক্যাপ্টেন গিয়াস মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখার জন্য এক কোম্পানী সৈন্য নিয়ে নিজেই রওনা দেন পাবনার উদ্দেশ্যে ১২ এপ্রিল সকালে। বানেশ্বরের কাছে পৌঁছার পরই যিনি জানতে পারেন যে পাক সেনাবহর হেলিকপ্টার গানশীপের সহায়তায় নাটোরের প্রতিরোধ ভেদ করে রাজশাহী শহরের দিকে অগ্রসর হয়ে পুঠিয়া পার হয়ে চলে এসেছে। আসার পথে তারা রাস্তায় দুই পাশের বাড়ি ঘর দোকান পাট ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান,মর্টার শেল ও হেলিকপ্টারের মেশিনগান থেকে গুলি করতে করতে সব পুড়িয়ে ও ধ্বংস করতে করতে ও পথে যাদের পাচ্ছে হত্যা করতে করতে মহাতান্ডবলীলার হুংকার এগিয়ে আসছে মহা সাইক্লোন ও টর্ণেডোর মত। বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের গোলার আওয়াজ শুনতে ও ধোঁয়া অবলোকন করতে পারছে। রাজশাহী সারদা মোড়েই তারা তখন রাস্তার দুই ধারে ও রাস্তার উপরে প্রতিরোধব্যূহ গড়ে তুলতে থাকে। এদিকে আগের পাঠানো দুই কোম্পানী বাঙালি সৈন্যরা পাকসেনাদের আক্রমণে টিকতে না পেরে পিছু হটতে হটতে বানেশ্বর হাট পর্যন্ত চলে আসে এবং বানেশ্বর নদীর উপরের ব্রীজটা ভেঙ্গে দেয়। বানেশ্বর হাটের কয়েকটা কাঁঠ মিল থেকে শত শথ কাঠ নিয়ে ভঙ্গ ব্রীজের দুই পাশেই কাঠের পাহাড় গড়ে তুলে যেন পাকসেনারা আর অগ্রসর হতে না পারে। ১২ এপ্রিলের সন্ধ্যের আগেই পাক সেনাবহর বানেশ্বর হাটের মধ্যে ঢুকে পরে ও ভাঙ্গা ব্রীজ আর কাঠের পাহাড়ের বেরিকেড দেখে আরো রেগে ক্ষেপে উত্তেজিত হয়ে যায়। তারা অবশেষে থমকে যায় এবং তাদের অগ্রসর হওয়া আপাতত বন্ধ হয়ে যায়। এদিকে সন্ধ্যে ঘনিয়ে এলে ধীরে ধীরে চারিদিকে অন্ধকার আচ্ছন্ন হয়ে পরে। পাক সেনারা তখন নিজেদের জন্য নিরাপদ আশ্রয়ের ব্যবস্থা করছে। আকাশে উড়া হেলিকপ্টারও রাতের অন্ধকারে নিরাপদ স্থানে চলে যায়। সুযোগ বুঝে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা ভাঙ্গা ব্রীজের এপার (রাজশাহী শহরের দিকে) থেকে রাস্তার দুই পার্শের নির্মিত ট্র্যাঞ্চ ও কাঠের ব্যারিকেটের আড়াল থেকে পাক সেনা বহরের উপর দূর্বার আক্রমণ শুরু করে। কয়েক শত মুক্তিযোদ্ধা মাত্র হালকা অস্ত্র নিয়ে কয়েক হাজার ভারী অস্ত্রের পাক সেনাদের উপর হামলা চালায়। পাকসেনারাও ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী কামান, মেশিনগান ও মর্টার শেল দিয়ে পাল্টা জবাব দিতে থাকে। শুরু হলো পূর্ণাঙ্গ প্রত্যক্ষ সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধ বাঙালি মুক্তিযোদ্ধা ও হানাদার পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মধ্যে। মুক্তিযুদ্ধের শুরুতে রাজশাহী অঞ্চলে সম্ভবত এইটাই সর্ব চেয়ে বড় সামনাসামনি যুদ্ধ। সারা রাত্রি ধরে হাজার হাজার গোলাগুলি বিনিময়ের মাধ্যমে এই সম্মুখ যুদ্ধ চলতে থাকে নাটোর ও রাজশাহী শহরের মাঝামাঝি স্থানে। বানেশ্বরের এই যুদ্ধে সারারাত ধরে যেন রাজশাহী ও নাটোর শহর মূহুর্মূহু প্রকম্পিত হচ্ছিল। বিশাল পাকসেনা বহরের দুই ডিভিশন সৈন্যে ভারী কামান ও মর্টারের গোলাগুলির মুখে মাত্র কয়েকশত হালকা অস্ত্র হাতের বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা সারারাত্রি ধরে যুদ্ধ করেও ক্লান্ত হয়নি ও এতটুকুও পিছনা হয়নি। এদিকে ক্যাপ্টেন গিয়াসের নেতৃত্বাধীন আর এক কোম্পানী সৈন্য রাতের মধ্যেই বানেশ্বরে এসে যুদ্ধে যোগদান করলে বাঙালি সৈন্যদের মনোবল ও শক্তি আরো বেড়ে যায়। সকাল হতেই আশে পাশের হাজার হাজার জনতা জয়বাংলা শে-াগান মুখরিত হয়ে বাঙালি সৈন্যদের সহযোগীতায় চলে আসে। কিন্তু পাকসেনাদের প্রচন্ড গোলাগুলির জন্য বাঙালি সৈন্য নিরস্ত্র জনসাধারণকে নিরাপদ দূরত্বে সরে যেতে বলে। তবুও বীর জনতা খাবার পানি, কাপড় ও ঔষধ নিয়ে বাঙালি সৈন্যদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে নির্ঘাত মৃত্যুর ভয়কে উপেক্ষা করে।

১৩ এপ্রিলের সকাল পেরিয়ে দুপুর পর্যন্ত ভালভাবেই বাঙালি মুক্তিসেনারা পাকবাহিনীর ট্যাঙ্ক বহরের বিরুদ্ধে বীরত্বের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছিল। মনে হচ্ছিলো পাকসেনারা হয়ত আর ভাঙ্গা ব্রীজ অতিক্রম করতে পারবে না এবং তারা হয়ত পিছু হটে আবার ঢাকার পথে ফিরে যাবে। তখন রাজশাহীকে মুক্ত অঞ্চল করেই রাখা যাবে। দ্বিপ্রহরে পাকসেনাদের পাল্টা গোলাগুলির পরিমাণ কিছুটা কমে আসলে বাঙালি মুক্তিসেনাদের মনে এই আশারই সঞ্চার হয়েছিল। কিন্তু দুপুরের পরপরই আকাশ দিয়ে উড়ে আসছে সেই হেলিকপ্টার গানশীপ আর সঙ্গে আরো দুই দুইটি পাক বিমান বাহিনীর ফাইটার পে-ন। সহসাই আকাশ থেকে মেশিন গানের আর মর্টারের গোলা এবং বিশাল বিশাল বোমা পড়া শুরু হলে বাঙালি মুক্তিসেনাদের অবস্থানের উপর দিয়ে। আর আকাশের গোলা ও বোমের সাথে সাথেই পাকসেনাদের ভাঙ্গা ব্রীজের এপার থেকে ট্যাঙ্ক, কামান ও মর্টারের গোলা পুনরায় যেন ঝড়ের মত বর্ষিত হতে লাগলো। আকাশ ও মাটির কামানের গর্জনে ও আঘাতে বাঙালি মুক্তিসেনারা হতচকিত হয়ে দূর্বল হয়ে পড়ল। আত্মরক্ষা করার মত সুযোগ ও শক্তিটুকুও যেন তারা হারিয়ে ফেলেছে। ক্যাপ্টেন গিয়াসের নির্দেশে তখন বাঙালি মুক্তিসেনারা আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে এবং ক্রোলিং করতে করতে খেত ফসলের মাঝ দিয়ে প্রতিরোধব্যূহ থেকে ধীরে ধীরে সরে রাজশাহীর অদূরে কাঁটিখালীতে পুনরায় একত্রিত হয়ে মুক্তিবাহিনী পুনগঠন করে নতুন করে প্রতিরোধ গড়ে তোলার পরিকল্পনা করতে থাকে। খবর আসে যে সন্ধ্যার দিকে পাকসেনারা বানশ্বেরের ভাঙ্গা ব্রীজের পাশ দিয়ে নদী পার হওয়ার জন্য মাটি ফেলে অস্থায়ী রাস্তা তৈরী করে তাদের ট্রাক, ট্যাঙ্ক ও অন্যান্য যাববাহন যন্ত্রপাতি নদীর ওপারে নিয়ে এসে মূল সড়ক দিয়ে পুনরায় রাজশাহী শহরের অভিমুখে রওনা হয়েছে। বাঙালি মুক্তিসেনারা পিছু হটে অবশেষে রাজশাহী শহরের দ্বারপ্রান্তে চলে আসে। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ও রাজশাহী ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ক্ষতি করতে পারে সন্দেহ করে বিশ্ববিদ্যালয় ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ পার হয়ে এসে তালাইমারী বাজারে পদ্মা নদীর বাঁধের ধারে

নাটোর রাজশাহী মহাসড়কের উপর আবারো ব্যারিকেড তৈরী করে নতুন করে প্রতিরোধব্যুহের সৃষ্টি করে। তালাইমারী বাজারে জেবর মিয়ার কাঠ মিলের সব কাঠ নিয়ে রাস্তার উপরে অনেক উঁচু করে ব্যারিকেড দেয়। ব্যারিকেড তৈরী করতে করতে রাত্রি পায় ১০টা বেজে যায়। ইতিমধ্যেই পাক সেনাদের আগমনের ভয়াবহ খবর চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে। পাকসেনাদের আগমনের পথে পথে কামানের গোলা ছাড়তে ছাড়তে তারা অগ্রসর হচ্ছে। প্রতি মিনিটে কয়েকটি কামানের গোলা ছাড়ছে তারা। আর এই কামানের গোলার বিকট শব্দে যেন আকাশ পাতাল প্রকম্পিত হচ্ছে। রাজশাহী শহরের বাড়ি ঘর দালান কোটাও যেন কেঁপে কেঁপে উঠছে। লোকজন বিশেষ করে নারী শিশু ও বৃদ্ধরা শহরের বাড়ি ছেড়ে নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

বাঙালি মুক্তিসেনারা বিশেষ করে মিলিটারী, ইপিআর, পুলিশ ও আনসার বাহিনীর সদস্যরা এবং ছাত্র যুবক স্থানীয় জনতা রাজশাহী শহরকে শত্রু মুক্ত রাখার জন্য পুনরায় একত্রে সমবেত হয়ে দুই ফ্রন্টে অবস্থান নিচ্ছে। রাজশাহীর উপশহরে পাকসেনা ছাউনীর চারিদিকে অবস্থান নিয়েছে কয়েক কোম্পানী সৈন্যরা। অপরদিকে নাটোর রাজশাহী মহাসড়কে তালাইমারী বাজারে অবস্থান নিয়েছে রাজশাহীকে শত্রু মুক্ত রাখার শেষ প্রচেষ্টায়। রাত্রী যতই গভীর হচ্ছে পাকসেনাদের কামানের গোলা আরো প্রচন্ড শব্দ আরো শহরের নিকটে চলে আসছে। সাথে মানুষের দেহের ও জমিনের কাপনও যেন বেড়ে চলেছে। অবশেষে রাত প্রায় এক'টা ত্রিশ মিনিটে পাকসেনাদের দখলদারী ট্যাংক এসে প্রথমে তালাইমারী বাজারে পৌঁছে। পুনরায় প্রতিরোধ ও ব্যারিকেড দেখে যেন পাকসেনারা ক্ষেপে আগুন হয়ে যায়। এদিকে বাঙালি মুক্তিযোদ্ধারা নিশ্চিত মৃত্যুর ঝুঁকি নিয়ে চারিদিক থেকে পাকসেনাদের উপর বৃষ্টির মত গুলি বর্ষণ করতে থাকে। পাকসেনাদের লেসার গানের আগুনে ও ট্যাঙ্কের কামানের ও মর্টারের গোলায় আশে পাশের বাড়িগুলোতে আগুন ধরে যায় এবং দাউ দাউ করে সব পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছিল। ট্যাঙ্কের আঘাতে পাহাড়ের মত উঁচু করে ব্যারিকেড দেওয়ার কাঠগুলো সব গড়িয়ে গড়িয়ে পড়তে থাকে। কামানের গোলায় বিশাল বিশাল কাঠগুলোও পুড়ে একাকার হয়ে গেল।

এই লেখকের বাড়ি (মামার বাড়ি) জেবরমিয়ার কাঠ মিলের সামনে রাস্তার বিপরীত দিকে পদ্মার বাঁধ ও রাস্তার মাঝখানে অবস্থিত। কাঠের মূল ব্যারিকেড এই লেখকের মামার বাড়ি থেকে জেবর মিয়ার কাঠ মিল পর্যন্ত বরাবর পুরো রাস্তার উপরেই দেয়া হয়েছিল। জেবর মিয়ার কাঠ মিল ও এই লেখকের মামার বাড়ি থেকেও মুক্তিযোদ্ধারা পাকসেনাদের উপর হামলা চালিয়েছিল। তাই পাক হানাদারদের প্রথম আক্রমণই চলে জেবরমিয়া কাঠ মিল ও এই লেখকের মামার বাড়ির উপর।

জেবর মিয়ার কাঠমিলের রাস্তার উপরে দেয়া ব্যারিকেডের কাঠগুলোর সঙ্গে এই লেখকের মামার বাড়িটাও আগুনে দাউ দাউ করে পুড়তে লাগল। এই সময় এই বাসায় এই লেখক স্বয়ং তার মামাতো ভাই গোলাম মোস্তফা বাচ্চু ও জেবর মিয়ার কাঠমিলের ম্যানেজার সাইফুল ইসলামসহ আরো অনেকে অবস্থান নিয়েছিল। একদিকে বাড়িটা পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে ও অপরদিকে প্রচন্ড গোলাগুলি চলছে। এহেন অবস্থায় এই বাড়িতে থাকা আর নিরাপদ মনে হলো না। বাড়ির পিছন দরজা দিয়ে দ্রুত বের হয়ে পদ্মার বাঁধের ওপাশে এসে বাড়ি ঘর ছেড়ে আশ্রয় নেয় নিরাপদ মনে করে। আরো হাজার হাজার লোকজন পদ্মার বাঁধের ধরে আশ্রয় নিয়েছে নিরাপদ থাকার জন্য। মনে হচ্ছিল শহরে নারী পুরুষের সব লোকই এই পদ্মার বাধের আড়ালে আশ্রয় নিয়েছে।অনেক মুক্তিযোদ্ধারা তখনও পদ্মার বাঁধের আড়াল থেকে পাক হানাদার বাহিনীর উপরে গুলি চালিয়ে যাচ্ছে।

মাত্র আধ ঘন্টার যুদ্ধের পরই পাক হানাদার বাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের দেয়া কাঠের ব্যারিকেড অতিক্রম করে শহরের দিকে এগিয়ে চলল। মুক্তিযোদ্ধাদের কমান্ডাররা তখন সবাইকে যুদ্ধাস্থল পরিত্যাগ করে রাজশাহী ও চাঁপাই নবাবগঞ্জের মাঝে গোদাগাড়িতে যেয়ে সমবেত হতে আহবান জানালো। আর এই সাথেই ঐতিহ্যবাহী রাজশাহী শহর পুনরায় শত্রুর দখলে চলে যায়।